

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সত্যানুসন্ধানী প্রেমচন্দ এবং তাঁর গল্প

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ইয়াসমিন আরা সাথী
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.9
Pages	১৩৩-১৪৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সত্যানুসন্ধানী প্রেমচন্দ এবং তাঁর গল্প

ইয়াসমিন আরা সাথী*

সার-সংক্ষেপ : মুনশী প্রেমচন্দ হিন্দি সাহিত্যের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। যাদুবিদ্যা, ভোজবাজি আর রূপকথার গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি হিন্দি সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মাত্রা এনে দিয়েছেন। হিন্দি সাহিত্যে তিনিই প্রথম বাস্তব জীবনমুখী গল্পের স্বাদ আনেন। পেশায় শিক্ষক তিনি তাঁর মূল ঝোঁকই ছিল আদর্শবাদ এবং চরিত্রগঠনের দিকে। অনেক ভারতীয়ের মতো তাঁরও বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় দুঃখ কষ্টের লাঘব হবে। তাঁর গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাস সজীব হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের কাহিনিভাগ কাশী, লক্ষ্ণৌ এবং প্রয়াগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কখনো কখনো বিহার এবং রাজস্থানের যাপিত জীবন গল্পে স্থান পেয়েছে। প্রেমচন্দের গল্পের প্রধান বিষয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণি-বিন্যাস, নৈতিকতা, সম্প্রদায়গত বিভাজন এবং মনস্তত্ত্ব। প্রেমচন্দের মূল লক্ষ্যই ছিল যাপিত জীবনের অন্তরালের সমস্যা উদ্‌ঘাটন এবং মুক্তি। জীবনের গভীর বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে সমাজ ও চরিত্র-পাত্রের অভ্যন্তর সত্যকে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

মুনশী প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬) হিন্দি সাহিত্যের মূলধারার শক্তিমান লেখক। তাঁর রচনায় ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট। ভারতের লক্ষ লক্ষ অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের হয়ে তিনি লিখেছেন। শুধুমাত্র হিন্দি সাহিত্যেই নয়, তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। প্রেমচন্দের পূর্ববর্তী যুগের এবং অব্যবহিত আগের যুগের সাহিত্যে সাধারণভাবে বাস্তবতার প্রকাশ থাকলেও সমাজের সমস্যাবলীর প্রখর রূপায়ণ নেই বা জীবনের গভীর প্রত্যয় রূপায়িত হয়নি (দিলীপ, ২০০৪ : ৮)। প্রেমচন্দের রচনায় সর্বপ্রথম জীবনের বিচিত্র বোধের বিকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। হিন্দি সাহিত্যের পাঠককে জীবনধর্মী গল্পের আস্বাদ দিয়েছিলেন তিনি।

প্রেমচন্দ পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ফলে আদর্শবাদ এবং চরিত্রগঠনের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। জীবনের অনুভববেদ্য সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে কৌতূহলোদ্দীপক ভাষা দিয়ে শুরু করেছিলেন সাহিত্যসাধনা। উর্দু ভাষায় তিনি লেখেন প্রথম উপন্যাস 'আসরারে মভ্‌গবিদ' (১৯০১)। ১৯০৩ সালে বারাণসীর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়।

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

হিন্দি সাহিত্যে তাঁকে 'উপন্যাস সম্রাট' আখ্যা দেওয়া হয়। উদার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি স্বদেশ-সমাজ-রাজনীতিকে তাঁর গল্পে এনেছেন। তাঁর শিল্পবোধ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের সাথে বাংলা সাহিত্যের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়ই অসহায় নিপীড়িত নারীর প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন এবং গ্রামীণ জীবন-জনপদকে সবার সামনে এনেছেন। সমকালে উভয়ই ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ চিত্রায়ণ ঘটেছে প্রেমচন্দের সাহিত্যে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আগমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; একনিষ্ঠ সাধনা, দুর্জয় তপস্যা, আর অধিত জ্ঞান তাঁকে পাঠকের কাছকাছি নিয়ে এসেছিল। সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি বিদেশি সরকারের উপাধি গ্রহণে রাজি হননি।

প্রেমচন্দ ছিলেন জাতশিল্পী। শৈশবে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনে গল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। গল্প রচনায় অভিজ্ঞতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। পেশাগত জীবনের শুরুতে ছিলেন লন্ডন মিশনারি স্কুলের শিক্ষক; চাকরিসূত্রে চুনার, এলাহাবাদ, বস্তি, কানপুর, গোরখপুর এসব জায়গায় বেড়িয়েছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। জীবনকে দেখার মতো চোখ তাঁর ছিল। একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'আমার বড় সাধ ছিল রেলওয়ে গার্ড হব। বেশ বহু জায়গায় ঘুরব, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হবে, কত কি ঘটনা জানব, কত চরিত্র...' (প্রেমচন্দ, ১৯২১)। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীর বক্তৃতা শুনে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বেনারসে চলে আসেন। বন্ধু মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দারের গ্রামে চরকা তৈরির কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং শহরে চরকার একটি দোকান খোলেন। এই সময়ই তিনি সিদ্ধান্ত নেন লিখেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। এরপর প্রেমচন্দের কলম থেমে থাকেনি। একের পর এক গল্প-উপন্যাস-নাটক লিখেছেন। এমনকি চলচ্চিত্রের কাহিনিও লিখেছেন।

ব্যক্তি প্রেমচন্দ নিরভিমান ও মিশুক স্বভাবের ছিলেন। সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি; ছিলেন আড়ম্বরহীন। চাষবাস এবং গো-পালনের আলোচনায় ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। তাঁর লেখা গল্পসমূহের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিক জীবনের প্রক্ষেপ লক্ষ করা যায়।

প্রেমচন্দের গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। পরিবার-সমাজ-রাজনীতি এবং মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন তাঁর গল্পের বিষয়রূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রেমচন্দের গল্পে সমকালীন জীবনবাস্তবতার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম গল্পসঙ্কলন *সোজে ওয়তন* যেটি উর্দু ভাষায় 'নবাব রায়' ছদ্ম নামে লেখা হয়। এই গল্পগ্রন্থে তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় মেলে। এই গল্পগ্রন্থটি ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গল্পগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। এরপরও প্রেমচন্দের কলম থেমে থাকেনি, তিনি নবাব রায়ের পরিবর্তে প্রেমচন্দ নামে লিখতে থাকেন।

প্রেমচন্দ প্রায় তিন শতাধিক গল্প লিখেছেন। এ গল্পগুলো যেসব গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে *সপ্তসরোজ* (১৯১৭), *নবনিধি* (১৯১৭), *প্রেম পূর্ণিমা* (১৯১৮), *বড় ঘর কী বেটী* (১৯২১), *লাল ফিতা* (১৯২১), *নমক কা দারোগা* (১৯২১), *প্রেম পচীসী* (১৯২৩), *ব্যাঙ্ক কা দীবালা* (১৯২৪), *প্রেম প্রসূন* (১৯২৪), *প্রেম দ্বাদশী* (১৯২৬), *প্রেম প্রতিমা* (১৯২৬), *প্রেম প্রমোদ* (১৯২৬), *শান্তি* (১৯২৭), *প্রেম তীর্থ* (১৯২৯), *পাঁচ ফুল* (১৯২৯), *অগ্নি সমাধি* (১৯২৯), *প্রেম চতুর্থী* (১৯২৯), *প্রেম প্রতিজ্ঞা* (১৯২৯), *সপ্ত সুমন* (১৯৩০), *প্রেম পঞ্চমী* (১৯৩০), *প্রেরণা* (১৯৩২), *সমর যাত্রা* (১৯৩২), *পঞ্চ প্রসূন* (১৯৩৪), *নবজীবন* (১৯৩৫) প্রভৃতি। জীবনের বৈচিত্র্য পিয়াসী প্রেমচন্দ তাঁর গল্পে দরিদ্র অসহায় নিপীড়িত জীবনের কথা নানাভাবে এনেছেন।

প্রেমচন্দের গল্পকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন : পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেমমূলক এবং মানবমনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নির্ভর; এছাড়াও পশুপাখিকে কেন্দ্র করে নীতিকথামূলক আরো এক শ্রেণির গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রামীণ জীবনের প্রধান নিয়ন্তা হচ্ছে কৃষিভিত্তিক পেশা। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ধর্ম-ঐতিহ্য, উৎসব, ভাষা, পোশাক, ঘরবাড়ি, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করে। প্রেমচন্দ পারিবারিক গল্পগুলোতে গ্রামীণ জীবনকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে হাসিকান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস-মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে এসব গল্পে। প্রেমচন্দ অত্যন্ত সফলতার সাথে মানুষের দ্বন্দ্বময় জীবনের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন গল্পে। পরিবারকেন্দ্রিক গল্পে পারিবারিক বন্ধনের ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পারিবারিক জীবনকেন্দ্রিক গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে 'বড় ঘর কী বেটী', 'ঈদগাহ', 'উদ্ধার', 'জ্যোতি', 'ভেন্ন', 'সুজান ভগত', 'রেষারেষি' ইত্যাদি।

একটি অভিজাত পরিবারের কন্যা আনন্দীর বিয়ে এবং তার সংসার জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'বড় ঘর কী বেটী' গল্পটি। অভিজাত পরিবারের কন্যা আনন্দী শ্রীকণ্ঠের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে খুব সহজেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। কিন্তু সংসার অনভিজ্ঞ এই মেয়েটির প্রতি তার দেবর লালবিহারী অবিচার করে। লালবিহারীর ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে স্বামীর কাছে আনন্দী অভিযোগ করে। শ্রীকণ্ঠ ছোটভাইয়ের হাতে স্ত্রীর অপমান মেনে নিতে পারে না। একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। শেষ পর্যন্ত লালবিহারী তার ভুল বুঝতে পেরে এই যৌথ পরিবারটির ভাঙন রোধ করে। আনন্দীও অনুতপ্ত হয়ে সবাইকে কাছে টেনে নেয়। গ্রামীণ সমাজে পারিবারিক জীবনে থাকে সুদৃঢ় মানবিক বন্ধন (ছন্দশ্রী, ২০০৯ : ৯২)। গল্পটিতে গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি লেখকের গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে।

পারিবারিক বন্ধন-নির্ভর আরো একটি গল্প 'ভেন্ন'। আবহমানকাল থেকে সমাজে শাশুড়ি-পুত্রবধূর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত। ভোলা মাহাতোর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রী পান্না সংসারে আসার পরই স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তান রঘুর ওপর অত্যাচার শুরু করে। সংসার এবং মাঠের যাবতীয় কাজ রঘুকে করতে হয়। সে তার কষ্টের কথা তার বাবাকে বলতে পারে না। কেননা তার পিতৃদেব তখন দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহে আত্মহারা। পান্না ভোলা মাহাতোর সংসারে এসে নিজেকে সুখী ভাবতে থাকে। কিন্তু এই সুখ তার বেশিদিন সহ্য হয় না। বিয়ের আট বছরের মাথায় তিনটি সন্তান রেখে ভোলা মাহাতোর অকালমৃত্যু হয়। বিধবা পান্না একবার ভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করবে, যা তার সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে। আবার তার মনে হয় দ্বিতীয় বিয়ের কারণে 'লোকে হাসবে, পাঁচকথা বলবে!' কিন্তু তার এই আত্মকথন একান্ত নিজের মধ্যেই থাকে। সৎসন্তান রঘুর মানবিকবোধ এবং তার সন্তানদের আপন করে নেওয়ার মনোবৃত্তি তাকে দ্বিতীয় বিয়ের ভাবনা থেকে সরিয়ে আনে। কেদার, ঝুনিয়া, লছমন, এবং খুন্নুকে রঘু ভ্রাতৃস্নেহে বড় করতে থাকে। রঘুর স্ত্রী মুলিয়া রঘুর ভ্রাতৃস্নেহকে স্বভাবিক ভাবে নিতে পারে না। শুরু হয় শাশুড়ি পুত্রবধূর দ্বন্দ্ব। কেননা মুলিয়া কখনোই চায়নি 'সোয়ামী মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খেটে মরবে, আর সৎ শাশুড়ি রানীর মতন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে। তার ছেলেরা নবাবজাদা সেজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ২)। মুলিয়া শাশুড়ির সংসার থেকে পৃথক হয়ে যায়। হিন্দিতে যাকে বলে ভেন্ন হয়ে যাওয়া। মুলিয়ার পৃথক সংসারে রঘু স্বাভাবিক হতে পারে না। কারণ 'হাঁড়ি ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপরও পাঁচিল পড়ে, ও খুব ভালো করে জানে। নিজের লোক এক-মুহূর্তে পর হয়ে যায়। ভায়ে ভায়ে সম্পর্ক ঘুচে যায়, পাড়াপড়শি হয়ে যায় (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ১১)। চোখের সামনে অর্থাভাবে ভাইবোনদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কেদার পুরোদস্তুর কৃষক বনে যায়। রঘুর হাতে তৈরি করা সংসারের এহেন দুর্গতি দেখে রঘু নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকে। ঘুমের মধ্যে তার মনে হয় বাপ ভোলা মাহাতো দরজার কাছে বসে তাকে ভৎর্সনা করছে। রঘু প্রতিবেশীর সঙ্গে মিশতে পারে না। তার প্রতিমুহূর্তে মনে হয় সে তার ভাইদের ফাঁকি দিয়েছে। আত্মদহনে দগ্ধ হতে হতে রঘু একসময় মারা যায়। নিরাশ্রয় মুলিয়া তখন বাধ্য হয়ে সৎ শাশুড়ির সংসারে গলগ্রহ হয়। দুই বিধবা নারী একত্র হয়ে একে অন্যের দুঃখের অংশীদার হয়। পান্না মুলিয়াকে তার বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চায়। কেদারের সাথে মুলিয়ার বিয়ে দিয়ে মুলিয়ার জীবনের সব রং ফিরিয়ে দিতে চায়। মুলিয়াকে যখন সে জানায় তখন মুলিয়ার মনে হয় :

> গত দশ বছর ধরে ও যা কিছু হারিয়ে ফেলেছিল, সে সবই যেন এই মুহূর্তে সুদে আসলে ফিরে এল ওর কাছে। ওর সেদিনের লাবণ্য, সেই উন্মেষ, সেই বিকচ যৌবনের আকর্ষণ, সেই কম্প্র নমনীয় তনু, সেই আয়ত চেখের আহ্বান। সব (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৩২)।

গল্পটি বিহারের গ্রামীণ সমাজজীবনকেন্দ্রিক। নিম্নবিত্তের এই কৃষক পরিবারটির কর্তা রঘু নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। ভাই-বোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তন করতে চেয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর পৃথক হওয়ার মনোবৃত্তি তার সব স্বপ্নসাধ নস্যাৎ করে দেয়। গল্পটিতে লেখক সমকালীন সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। সমকালীন ভূমিব্যবস্থার কারণে কৃষক এতই দরিদ্র হয়ে পড়ে যে একটি ফসল নষ্ট হলে কৃষককে পথে দাঁড়াতে হয়। ইংরেজ সরকার সবসময়ই কৃষকদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে। রঘু সব সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ভালো কৃষক হওয়ার জন্য। পারিপার্শ্বিক কারণে সে ব্যর্থ হয়। তবে কেদার অনেক পরিশ্রমী এবং হিসেবি। কেদার তার ভাইয়ের মৃত্যুর সময় পাশে থাকেনি ঔষধ কিনে দেওয়ার ভয়ে। আখের জমিতে পানি দেওয়ার অজুহাতে সে পালিয়ে যায়। গল্পটিতে গল্পকার আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন বাস্তবতার নিরিখে :

উপমা : পাকা গমের মতো রঙ... (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৬)।

উৎপ্রেক্ষা : এ হল যেন হাঁড়ির সঙ্গে বেড়ির সম্পর্ক (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ১)।

প্রবাদ : সবলের উঁচু গলা সবাই শোনে। নিরুপায়ের আকুতি কেউ আমলই দেয় না (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ১)।

অতিশয়োক্তি : তার গায়ের গোধূমবরণে রোদের সোনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। উষার ভাঁড়ারে রূপ রস গন্ধ সুষমার যা-কিছু সওদা ছিল, মনে হয় সবই সেই রূপের চুম্বকে বাঁধা পড়ে গেছে (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৬)।

'রেষারেষি' গল্পের পটভূমি নির্মিত হয়েছে জোখু ভগত আর বেচন চৌধুরির ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নিয়ে। জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে এই দুজনের দ্বন্দ্ব। মামলা করতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তারপরও জমির দাবি ছাড়েনি। তাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব গ্রামের মানুষের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি তৈরি করেছে। গল্পটিতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাময় জীবন বোঝাতে চমৎকার উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, 'স্কুলের পড়ুয়ারা সবাই ক্ষীণ, দুর্বল, রুগীর মতো দেখতে, তাদের পরনে ছেড়া কাপড় (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ২১৯)।

পারিবারিক বন্ধন বিশেষত দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে অসাধারণ একটি গল্প 'অমাবস্যার রাত'। গল্পটি শুরু হয়েছে একটি চমৎকার উপমা দিয়ে 'এখন এ বাড়ি যেন ইংরেজি পাঠশালার ছাত্র মাটির সাথে যার নাড়ির যোগ নেই (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৩৮)। ভগ্নপ্রায় একটি সামন্ত পরিবারের প্রধান পণ্ডিত দেবদত্ত এবং তার মুমূর্ষু স্ত্রী গিরিজাকে কেন্দ্র করে গল্পটি নির্মিত। অসম্ভব স্বপ্নবাজ দেবদত্ত একসময় ভেবেছিল সংসারে সে পূর্বপুরুষের জৌলুশ ফিরিয়ে আনতে পারবে। সাতান্নর বিদ্রোহের সময় তাদের পারিবারিক ব্যবসায় ধস নামে, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিবেশ স্বাভাবিক হলেও তাদের সংসারের অবনমন হতেই থাকে। একসময় ভাঙা বাড়িটা ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি

দেবদত্তের হাতছাড়া হয়ে যায়। দেবদত্ত যক্ষের ধনের মত পুরনো কিছু কাগজপত্র আগলে রাখে। তার বিশ্বাস এই ছেঁড়া উইয়ে খাওয়া কাগজগুলো একদিন তার হারানো প্রতিপত্তি ফিরিয়ে দেবে। নিঃসম্বল দেবদত্ত অসুস্থ স্ত্রীকে বাঁচাতে কবিরাজের শরণাপন্ন হয়। কবিরাজের ফিস দিতে অপারগ হওয়ায় কবিরাজ দেবদত্তকে ফিরিয়ে দেয়। ভগ্নহৃদয়ে বাড়ি ফিরে অভিমানে দেবদত্ত যখন পুরনো কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক সেই মুহূর্তে তার কাছে এক যুবক আসে। পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণ এবং তাদের কৃতঋণ থেকে মুক্তি দেওয়াই যুবকের লক্ষ্য। দেবদত্তের পিতামহ একবার এক জমিদারকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল, সে টাকা সুদে আসলে পঁচাত্তর হাজার হয় যা সে দেবদত্তকে দিয়ে যায়। দেবদত্ত টাকা নিয়ে ঘরে গিয়ে দেখে গিরিজা মারা গেছে। দেবদত্ত সমস্ত টাকা নিয়ে গিয়ে কবিরাজের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে স্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষা চায়। কবিরাজ তার ভুল বুঝতে পারে।

'অনল-সমাধি' গল্পটি দাম্পত্য প্রেমনির্ভর। পুরুষশাষিত সমাজে নারীর নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সেবা– এই বৃত্তিগুলিকে যতখানি প্রয়োজনীয় মনে করা হয়, ঠিক ততখানি অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয় তার তেজী অনমনীয় ব্যক্তিত্বকে (কৃষ্ণা, ২০০৩ : ৬৫)। গল্পের নায়ক কর্মঠ প্রয়াগ হঠাৎ করেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে উপলব্ধি করে জটাধারী বাবার পাশে সভা-আলো করা ভক্ত মহাজনদের মজলিশে রসের দম লাগানোর যত মজা জীবন যুদ্ধে ততটা মজা নেই। আফিমের নেশায় প্রয়াগ স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। স্ত্রী রুক্মিণীর তেজী স্বভাবের কারণে তার সাথে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। প্রয়াগ রুক্মিণীকে শাস্তি দিতে পুনরায় বিয়ে করে। রুক্মিণীর তেজী স্বভাব কিছুটা নমনীয় হয়। সতীন সিলিয়ার সাথে সে মিলেমিশে থাকতে চায় কিন্তু সিলিয়ার আধিপত্যবাদী মনোভাবের কাছে বারবারই সে হেরে যায়। সিলিয়ার কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে রুক্মিণী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। প্রতিবাদী রুক্মিণী প্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নেয়। রাত্রে প্রয়াগ ফসলের জমি পাহারা দিতে গেলে প্রয়াগের চালায় সে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশাগ্রস্ত প্রয়াগ হঠাৎ আগুন দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রয়াগ মাঠের পাকা ফসল রক্ষার্থে চালাটি মাথায় নিয়ে দৌড়াতে থাকে :

> কিনারার ক্ষেত, কাছাকাছি এসে পড়েছে। এসে পড়ল। আর দুটো সেকেন্ডের মামলা। সামনে বৈজয়ন্তীর সিংহতোরণ– মাত্র বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। তার ওপারে স্বর্গ– এপারে নরক। কিন্তু এদিক জ্বলন্ত মাচানঘরটা প্রয়াগের মাথার ওপরে নেমে এসেছে।
>
> এক ঝটকায় এখনো ওটাকে ঘাড়ের ওপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়া যায়। তাতে প্রাণ বাঁচে। কিন্তু কার প্রাণ? না, প্রয়াগের প্রাণের ওপর মোহ নেই। তাই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে প্রয়াগ দৌড়াচ্ছে। ... হঠাৎ কে একজন সামনের গাছতলা থেকে প্রয়াগের দিকে ছুটে এল। মেয়েছেলে। (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৬৫)।

অগ্নিদগ্ধ প্রয়াগকে দেখে রুক্মিণী মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে। 'সে তাড়াতাড়ি প্রয়াগের সামনে এসে মাথা নিচু করে জ্বলন্ত খোড়ো চালার নিচে চলে এল। তারপর সেটাকে জড়িয়ে ধরল।' ফলস্বরূপ অগ্নিদগ্ধ হয়ে রুক্মিণী মারা যায়। প্রয়াগ অর্ধদগ্ধ হয়ে এক সপ্তাহ বেঁচেছিল। গল্পটির শেষে লেখক চমৎকার একটি শ্লেষ ব্যবহার করেছেন, 'প্রয়াগের শরীরে আর কিছু ছিল না। খানিকটা আগুনে শেষ করেছিল, বাকিটা শোকে (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৬৬)। দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে প্রেমচন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প এটি।

সামাজিক গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে 'সদগতি', 'পৌষ নিশিথে', 'কাফন', 'দুধের দাম', 'একমুঠো গম', 'সল্ট ইন্সপেক্টর', 'ঠাকুর কা পুতনা', 'বালক', 'সমরযাত্রা' ইত্যাদি।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব-হিসেবে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাজ ও সমাজবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রেমচন্দ গভীরভাবে সমাজমনস্ক কথাকোবিদ। প্রেমচন্দের শিল্পবোধের সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে তাঁর সামাজিক গল্পে। তাঁর গল্পে তিন শ্রেণির মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত । উচ্চবিত্তের মধ্যে রয়েছে জমিদার, মহাজন; যারা নির্মম নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে কৃষক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। সামন্ত মনোভাব এবং উদ্ভিন্নমান পুঁজিবাদের নিকট নিম্নবর্গ অসহায়ভাবে মার খেয়েছে। এই নিম্নবর্গের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে, যথা অর্থনৈতিকভাবে অসহায় শ্রেণি যারা একেবারেই নির্বিত্ত, অন্যটি জাতিবর্ণ প্রথায় (cast system) নিম্নশ্রেণি। প্রেমচন্দ তাঁর গল্পে জীবনায়ন এবং সমাজ বিশ্লেষণে চরিত্রের হৃদয়বৃত্তি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্ণ-বিভাজিত সমাজ, অর্থনৈতিক অপশাসন ইত্যাদি বিষয় যুগপৎভাবে তাঁর গল্পে এসেছে।

ঋগ্বেদের শেষভাগে রচিত দশম মণ্ডলের পুরুষাসূক্ত অনুসারে আদিপুরুষকে খণ্ড খণ্ড করে তার মুখ থেকে তৈরি হয় ব্রাহ্মণ, দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, দুই উরু থেকে বৈশ্য এবং দুই পা থেকে শূদ্র। এখানেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পেশার সাথে সামাজিক মর্যাদা এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পেশার সাথে সামাজিক হীনস্থানের সূচনা হয় (কল্যাণী, ২০০৯ : ৮)। আর এই চার বর্ণের বাইরে যারা তাদেরকে বলা হয় নমঃশূদ্র। ভারতবর্ষে সমাজকাঠামোতে ব্রাহ্মণরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বহিরাগত এই গোষ্ঠী বাংলার সমাজকাঠামোতে, বর্ণ ব্যবস্থার সুবাদে অভিভাবকত্বের মর্যাদায় উন্নীত হয় (বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ১৩)। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ব্রাহ্মণরা সমাজের নিম্নশ্রেণিকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে এবং প্রচার করে মানুষের পাপ মোচনের জন্য তারা পৃথিবীতে এসেছে। *সদগতি* গল্পে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি ভক্তির প্রতিদান দেখানো হয়েছে।

'সদগতি' গল্পের মূল বিষয় বর্ণকৌলিন্য। 'সদগতি' গল্পের মাধ্যমে প্রেমচন্দ বর্ণবিভাজিত ভারতবর্ষকে সামনে আনলেন। যেখানে নিম্নবর্গকে দেখা হয় নিষ্ক্রিয়,

ভীরু, একান্ত অনুগত জীব হিসেবে (শুভঙ্কর, ২০১৩)। গল্পের প্রধান চরিত্র দুখীও ঠিক তাই। দুখিয়া চামার। তার মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ অর্থাৎ শুভক্ষণ নির্ণয়ের জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বাড়িতে আনতে চায়, এজন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টাও করে। তার স্ত্রী ঝুরিয়া তাকে বামনপাড়া থেকে খাটিয়া আনতে বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বসতে দেওয়ার জন্য। দুখী জানায় :

> বামনপাড়ার লোকজন আমাকে কেন খাটিয়া দেবে। কুঁয়োর এক কলসী পানি পাই না, আবার খাটিয়া দেবে। একি আমাদের ঘুঁটে, কঞ্চি, ভূষি কিংবা কাঠ যে যার যেমন খুশি নিয়ে চলে যাবে। নাও আমাদের খাটিয়াটেকেই ধুয়ে মুছে রেখে দাও। গরমের দিন, ঠাকুর মশাই আসতে আসতে শুকিয়ে যাবে (প্রেমচন্দ, ১৯৯২ : ১৯)।

দুখীর আত্মসম্মানবোধ প্রখর তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় পণ্ডিত এলে মহুয়া পাতা পেড়ে বসতে দেবে। কেননা মহুয়া পাতায় বড় বড় লোকেরা খায়, অতএব মহুয়া পাতা পবিত্র। ঝুরিয়া পণ্ডিতকে প্রসাদ (দুখীর ভাষায় সিধে) দিতে চাইলে সে থালায় সিধে দিতে নিষেধ করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উঁচু বংশের মানুষ। তাদের থালায় নাও খেতে পারে। ঠাকুরের নজরানা হিসেবে সে একসের আটা, আধসের চাল, আধপোয়া ঘি, চার আনা পয়সা দিতে চায়। এগুলো সে গোঁড়ের মেয়েকে ডেকে মহুয়া পাতায় সাজিয়ে নিতে স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়। কারণ দুখী জানে তারা সমাজে অপাঙক্তেয়। সমাজের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মেয়ের সুখী ভবিষ্যতের আশায় সে একবাণ্ডিল ঘাস নিয়ে পণ্ডিত মশাইকে আনতে যায়।

দৈহিক শুচিতা রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ কায়িক শ্রম থেকে বিরত থাকে। আচারগত পরিশুদ্ধতার অজুহাতে তারা নীচজাতি থেকে কায়িকশ্রম গ্রহণ করে (মিল্টন, ২০০৯ : ৭২)। পণ্ডিত ঘাসীরামও একই মনোবৃত্তির মানুষ। দুখী ঘাসীরামকে জানায় মেয়ের বিয়ের জন্য পুঁথি দেখে তার বাড়ি গিয়ে শুভলগ্ন নির্ধারণ করে দিতে। ঘাসীরাম এই সুযোগে বিনা পয়সায় তাকে দিয়ে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করিয়ে নেয়। এরপর তাকে কাঠ চিরে দিতে বলে। দুখী যেহেতু ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করে কাঠ চেরায় যেহেতু এরকম কঠিন পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত নয়। তাই সারাদিন চেষ্টা করেও কাঠের গুড়ি চেরাই করতে পারে না। তখন পণ্ডিত তাকে তিরস্কার করে বলে, 'নাও কুড়াল তুলে নাও। কাঠটা চিরে দাও। তোমাকে দিয়ে একটু কাঠও চিরা হয় না। লগনও তাহলে তেমনি বের হবে। আমাকে কিন্তু দোষারোপ করতে পারবে না' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ২২)। নিরন্ন দুখী সোৎসাহে কুড়াল তুলে নেয়। আর মনে মনে ভাবে পণ্ডিত মশাই শুভলগ্ন ঠিক করে দিলে তার মেয়ে ভালো থাকবে। এরপর প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ কুড়াল চালিয়ে সে কাঠখানা দ্বিখণ্ডিত করে। কাঠখানা দ্বিখণ্ডিত করতেই তার হাত থেকে কুড়ালটা ছিটকে পড়ে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অবসন্ন দেহ নিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এখানেই

গল্পের সবচেয়ে বড় আয়রনি। দুখীর মৃত্যুর পর খিচুরী চামার চামারবস্তির কাউকে লাশ নিয়ে আসতে দেয় না। সে সবাইকে সাবধান করে দেয় 'কেউ যেন লাশ আনতে না যায়। কারণ পুলিশ আসবে, তদন্ত হবে। মজা পেয়েছে নাকি একজন গরিবকে এভাবে জানে মারবে (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ২৩)। লাশ পচে গন্ধ বের হয়। গভীর রাতে পণ্ডিত দড়ির ফাঁস তৈরি করে লাশের পায়ে লাগিয়ে কুকুর শেয়ালের মতো টানতে টানতে লাশটিকে গ্রামের বাইরে ফেলে আসে। দুখীর লাশ কুকুর, শেয়াল, শকুনে ছিঁড়ে খায়। ব্রাহ্মণ-ভক্তির পুরস্কার সে পেয়ে যায়। আর পণ্ডিত বাড়ি ফিরে স্নান করে, সারাবাড়িতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুজোয় বসে।

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং গোত্র-ধর্ম-পেশা সূত্রে নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেমচন্দের সহানুভূতি অপরিসীম। প্রান্তিক অস্পৃশ্য চামার সম্প্রদায়কে নিয়ে তিনি একাধিক গল্প লিখেছেন। বংশানুক্রমিকভাবে এ সম্প্রদায় সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। অর্থনৈতিকভাবে এরা কখনো সফল হলেও বংশ-পরিচয়গত স্তরায়ণ অতিক্রম করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে Arnold Green-এর মন্তব্য স্মরণীয় : 'Caste is a system of stratification in which mobility, up and dwon the status ladder, at least ideally may not occur' (Green, 1981 : 88)। পুঁজির অসম বিকাশ যেখানে বিদ্যমান সেখানে বর্গভেদ অনস্বীকার্য। প্রয়োজনে দুখীয়া মুচির জীবন নিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। এরকমই আরেকটি গল্প 'ঠাকুর কা কুআঁ'। জোখু নিম্নশ্রেণির হওয়ায় ঠাকুরের কুয়ার জল খাওয়ার অনুমতি পায় না। সে যে কুয়োয় জল খায় তা দুর্গন্ধযুক্ত, সে কুয়োতে জন্তু জানোয়ার মরে পড়ে থাকে। জোখুর স্ত্রী রাতের আঁধারে ব্রাহ্মণের কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দেখে জোখু তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করছে।

অন্ত্যজ জীবনের মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় 'কাফন' গল্পে। গল্পের প্রধান দুই চরিত্র ঘিসু এবং মধু পিতা-পুত্র। ব্যক্তিগত জীবনে দুজনেই অলস। কাজ করার ভয়ে জীবনধারণের সামান্যতম উপকরণ নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বেঁচে থাকে সে। গোটাকয়েক মাটির বাসন এবং এক জোড়া ছিন্ন ভিন্ন ধুতি তাদের সম্বল। লেখকের ভাষায়, 'ওরা এক বিচিত্র ধরনের মানুষ। ঋণে জর্জরিত অথচ হাসি-খুশি, চেখে-মুখে এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৪৯)। তাদের দুরবস্থা দেখে লোকে কষ্ট পায় কিন্তু ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এরকম পরিস্থিতিতে মধুর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী অর্ধাহারে, অনাহারে সারারাত যমের সাথে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে। বুন্দিয়ার মৃত্যুর সময় ঘিসু যখন মধুকে বলে 'সারাদিন ধরে যন্ত্রণায় ভুগে হতভাগীটা মারা যাবে। যা একটিবার দেখে আয় না' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৪৯)। মধু তখন বিদ্রূপের স্বরে বলে 'হারামজাদি মরতে দেরি করছে কেন? মরবে তো এখুনি মরে না কেন (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৪৯)। বুন্দিয়ার যন্ত্রণাকাতর মুখের চেয়ে সামনে অর্ধসিদ্ধ আলু মধুর কাছে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় কারণ সে জানে বুন্দিয়াকে দেখতে গিয়ে তার বাবা আলুগুলো সব খেয়ে নেবে। মধু

আলু খেতে খেতে তার বাবার কোন এককালে পরিতৃপ্তির সাথে ভরপেট খাবারের গল্প শোনে এবং একসময় বাপ-বেটা ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উঠে মধু ঘরে গিয়ে দেখে বুন্দিয়া মরে পড়ে আছে 'মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। ভনভন করে মাছি উড়ছে, সাদা মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে।' রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা শক্ত লাশটি সৎকারের জন্য প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে পাঁচটি টাকা দেয়। এই টাকা নিয়ে বাপ-বেটা বাজারে যায় কাফন কিনতে। পিতা-পুত্র বুঝে উঠতে পারে না, যে বুন্দিয়া বেঁচে থাকতে কখনো ভালো কাপড় পরতে পারেনি মৃত বুন্দিয়াকে 'একখানা নতুন কাফন কেন দিতে হবে?' তবে একটা বিষয়ে তারা উভয়ে একমত হয় এই টাকা আগে পেলে বুন্দিয়ার চিকিৎসা করানো যেত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে পিতা-পুত্রের মদের নেশা পেয়ে বসে। তারা কাফনের টাকায় মদ খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল অবস্থায় মধু প্রশ্ন করে 'লোকে ব্রাহ্মণদের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে কেন? কেমন করে ওরা বুঝল, মৃত্যুর পর এর বদলে ওরা কিছু পাবে' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৫২)। আর ঘিসু প্রশ্ন তোলে বড়লোকগুলো গরিবদের শোষণ করে পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য গঙ্গায় স্নান করে আর মন্দিরে ভোগ দেয়, তারা কীভাবে স্বর্গে যাবে?' প্রকৃত পক্ষে এ প্রশ্ন লেখকের। মাতাল অবস্থায় ঘিসু এবং মধু বুন্দিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কেননা বেঁচে থাকতে বুন্দিয়া তাদের পরিশ্রম করে খাইয়েছে আর মরে গিয়ে বুন্দিয়া তাদের পেটপুরে মদ খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অতএব বুন্দিয়া স্বর্গে যাবে।

'দুধের দাম' গল্পে জমিদারের তিন কন্যার পর পুত্রের জন্ম হয় ধাত্রীর হাতে। জমিদার গিন্নির দুগ্ধাভাবে ধাত্রীই দুগ্ধমাতা হয়। জমিদার বাড়িতে ধাত্রী ভূঙ্গীর কদর বেড়ে যায়। জমিদার বাড়ির গরুর দুধ ভূঙ্গীর বাড়িতে যায় ভূঙ্গীর দুগ্ধপোষ্য পুত্র মংলুর জন্য। জমিদার বাড়িতে ভূঙ্গীর দাপট বেশিদিন টেকে না, কেননা গ্রামের ব্রাহ্মণরা জমিদার পুত্র মেথরানীর দুধে পালিত হওয়ায় আপত্তি জানায়। ফলে মেথরানী ভূঙ্গীকে জমিদার বাড়ি ছাড়তে হয়। এরমধ্যে ভূঙ্গীর স্বামী প্লেগে মারা যায়। মংলুকে নিয়ে ভূঙ্গীর কোনরকম দিন কাটছিল কিন্তু জমিদার বাড়ির নালা পরিষ্কার করতে গিয়ে সাপের কামড়ে ভূঙ্গীর মৃত্যু হয়। মংলু অনাথ হয়ে পড়ে। জমিদার বাড়ির দোরে সে সবসময় পড়ে থেকে জমিদার পুত্র সুরেশের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ে ওঠে। গ্রামের কোনো বালক তার সাথে মিশত না। তার কেবল সঙ্গী হাড় বের হওয়া এক কুকুর যে তারই মতো অনাথ। 'বেচারি ভয়ে রাস্তায় বের হতো না। কুণ্ডলী পাকিয়ে দিনরাত মঙ্গলের আস্তানার পাশে পড়ে থাকত। একটি অবোধ প্রাণী আর একটি অবহেলিত মানবসন্তান দু'জনেই ছিল এক' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৭৭)। সুরেশ একদিন মঙ্গলকে ঘোড়সওয়ার বানায়; মঙ্গল লিকলিকে শরীর নিয়ে বেশিদূর যেতে না পারায় সুরেশ তার মায়ের কাছে গিয়ে মঙ্গলের নামে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে বলে 'মংলু ছুয়ে দিয়েছে'। এরপরই মংলুকে জমিদার বাড়ির দোর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বাধ্য হয়ে মংলু আর তার কুকুর জমিদারের গৃহদোরে উপস্থিত হয়। সুরেশের থালার উচ্ছিষ্ট পেয়ে সে

আর তার কুকুর একই সানকিতে খেতে বসে। মংলু খায় আর কুকুরকে বলে 'লোকে বলে মায়ের দুধের দাম কেউই দিতে পারে না। আমি আমার মায়ের দুধের দাম এভাবেই পাচ্ছি' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ৮০)।

'গাঙ্গু' গল্পটিতে মানবতার জয়গান গেয়েছেন লেখক। গল্পটির সাথে গী দ্য মোপাসাঁর *Simon's Papa* গল্পের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। লেখক অর্থাৎ গল্প-কথকের বাড়ির চাকর গাঙ্গু উচ্চবংশীয় কিন্তু দরিদ্র। গাঙ্গুর বংশগৌরব এবং তার ব্যক্তিত্বের কারণে অনেকেই তাকে সমীহ করে চলত। এই গাঙ্গুই একদিন বহুভোগ্যা নারী গোমতীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে এবং চাকরি ছেড়ে দেয়। সামাজিক সম্মান এবং সুখের কথা ভেবে সবাই তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বিয়ের ছয় মাস পরে গোমতী অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়। গাঙ্গু দুঃখে ভেঙে পড়ে। অনেক খোঁজাখুজির পর গোমতীকে একটি নবজাতকসহ নিয়ে আসে সে। গাঙ্গু গোমতীর এই অবৈধ সন্তানকে স্বীকৃতি দিয়ে বলে 'অন্যের বোনা ফসল হলেও কেউ কি তা নিতে অস্বীকার করে?'[৩৭] এখানেই প্রেমচন্দের মহত্ত্ব। লেখক গাঙ্গুর উদারতাকে সম্মান জানিয়েছেন।

'স্বর্গাদপি' গল্পটি এক অনামা ব্যক্তির আত্মকথনে রচিত। এই নামহীন ব্যক্তি জীবনের শুরুতে অর্থ এবং বিত্তের লোভে আমেরিকা প্রবাসী হয়। তার ভাষ্যে, 'আমার আকাশ-ছোঁয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর পর্বতপ্রমাণ বিষয়-বুদ্ধি আমাকে দেশান্তরী করেছিল' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ২২৩)। প্রবাসজীবনে সে অর্থ ও প্রতিপত্তির মালিক হয় কিন্তু মানসিক শান্তি পায় না। নব্বই বছর বয়সে সে ভারতবর্ষে ফিরে আসে। বহু জায়গায় ঘুরে অবশেষে শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত নিজের গ্রামে গঙ্গার ধারে শান্তি খুঁজে পায় সে। এখানেই সে তার বাকি জীবনটা কাটাবে বলে মনস্থির করে। গল্পটি উত্তমপুরুষে রচিত। এই অনামা নায়কটি প্রবাসজীবনে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গবোধ করেছে। শেষজীবনে গঙ্গার ধারে শান্তি পেয়েছে সে, তার একটাই প্রত্যাশা, 'যেন পার্থিব স্মৃতির অবশেষ আমার অস্থিগুলি গঙ্গার পুতগর্ভে বিসর্জন দিতে পারি' (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ২২৩)।

পৌষ মাসের তীব্র ঠাণ্ডায় হলকু আর তার কুকুরের রাত্রিযাপনের কাহিনি নিয়ে রচিত 'পৌষ-নিশীথে' গল্প। হলকু দিনমজুর হয়ে থাকবে না বলে জমি চাষ করে। জমির ফসল রাত্রে নীল গাইয়ের দল এসে নষ্ট করে দেয়। নীল গাইয়ের দলকে প্রতিরোধ করতে হলকু এবং তার পোষা কুকুর জবরা মাঠ পাহারা দিতে যায়। শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় হলকু এবং জবরার একই অবস্থা হয়। কনকনে ঠাণ্ডায় জবরা তার মনিবকে ছেড়ে যাবে না। অগত্যা হলকু জবরাকে বাঁচাতে তাকে কোলে টেনে নেয় এবং একে অন্যের শরীরের উষ্ণতা ভাগ করে নেয়। 'হলকুর পবিত্র চরিত্রে জবরার প্রতি ঘৃণার লেশমাত্র নেই; আর জবরার চিত্তে তো স্বর্গসুখ (প্রেমচন্দ, ১৯২১ : ১৬৫)। উভয়েরই যন্ত্রণার মূলে দারিদ্র্য কিন্তু শীতের রাতে একে অন্যের উষ্ণতা অনুভব করে দারিদ্র্যের

এই চরম দুর্ভোগকে ভুলে যায়। উভয়েরই জীবনের ওপর আর কোনো আক্রোশ থাকে না। এরপরই হঠাৎ করে নীল গাইয়ের দল জমিতে আক্রমণ করলে জবরা মনিবের উষ্ণতা নিয়ে নতুন উদ্যমে প্রতিহত করতে যায়। অন্যদিকে ক্লান্তি এবং অবসাদে হলকু ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উঠে দেখে তার সমস্ত ফসল নীল গাইয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। তারপরও হলকু কষ্ট পায় না কারণ সে বুঝে যায় কৃষক হওয়ার চেয়ে মজুর হওয়া পারতপক্ষে সহজ। কেননা মজুর হলে রাত্রে ঠাণ্ডায় ক্ষেত পাহারা দিতে আসতে হবে না।'

গল্পটিতে প্রান্তিক মানুষের জীবনের বাস্তবতা লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শীতের রাতে ফসল পাহারা দিতে গিয়ে হলকু উপলব্ধি করে জীবনের কঠিন বাস্তবতা। পয়সার অভাবে সে কম্বল কিনতে পারেনি। পাইক এসে তার জমানো সব টাকা নিয়ে যায়, তাই সে বলে 'মজুরী করবে একজন আর মজা লুটবে আরেকজন।' অনেক কষ্টে সে ফসল উৎপাদন করে কিন্তু ফসল বিক্রির সমস্ত টাকায় পাওনাদারের বকেয়া পরিশোধে চলে যায়। স্ত্রীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা হলকুর নেই কেননা তার সমস্ত টাকা ধার পরিশোধে চলে যায় স্ত্রীর জন্য সে কিছুই রাখতে পারে না। তাই সে স্ত্রীর ওপর মেজাজ দেখাতে পারে না।

'পরীক্ষা' গল্পে গল্পকার দেওগড় রাজ্যের দেওয়ান খোঁজার অন্তরালে প্রকৃত মানুষ খুঁজেছেন। 'সল্ট ইন্সপেক্টর' গল্পে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের সল্ট ইন্সপেক্টর হওয়া এবং তার পেশাগত সততার প্রশংসা করেছেন। 'পঞ্চ পরমেশ্বর' গল্পে প্রেমচন্দ আদর্শবাদ এবং ন্যায়নীতির প্রশংসা করেছেন। জুম্মন সেখ এবং অলগু ঘটনাক্রমে পরসুরের শত্রু হলেও বিচারকের আসনে বসে দুজনেই নীতিবান এবং সৎ। দুজনের বিচারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পায় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চায়েতের মহিমা।

রাজনৈতিক গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আলহা', 'জুগুন কী চমক', 'বিচিত্র লোহী', 'লাগ ভাট', 'লাল ফীতা', 'দুনিয়াকা সবসে অনমোল রত্ন', 'মৈকু', 'সত্যাগ্রহ' ইত্যাদি।

মানুষের ব্যক্তিগত ও যৌথজীবন, তার নৈতিক মানসিক, আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন, তার শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে জীবন চলতে পারে না (রমেন্দ্র, ১৯৮৯ : ৩) প্রেমচন্দের গল্পে রাজনীতিবোধের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অত্যাচারী জমিদার মহাজনরা তার জাত শত্রু। স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রেমচন্দ সাধারণ মানুষের বোধকে জাগরিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচকের অভিমত :

> যখন বঙ্গভঙ্গ প্রয়াসের বিরুদ্ধে চলছে তীব্র আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ জেগে উঠেছে প্রবল

> প্রেরণায়, সমগ্র দেশের মানুষ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে; অন্যদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বর্বর অত্যাচারে সমস্ত আন্দোলনকে দমন করতে উদ্যত হয়েছে। এই পটভূমিকায় লেখা প্রেমচন্দের রচনায় স্বদেশ-চেতনার তীব্র প্রতিফলন ঘটেছে (দিলীপ, ২০০৪ : ২৪)

প্রেমচন্দ কখনোই সক্রিয় রাজনীতি করেননি। তবে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সমর্থন জানা যায় লেখক-জীবনের শুরু থেকেই। 'জামানা' এবং 'আওয়াজে-খল্‌ক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি লক্ষ করেন কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের তুলনায় বেনারস, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে স্বদেশী আন্দোলন অনেক দুর্বল (সামাদী, ১৯৯৭ : ১৯৭)। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে প্রেমচন্দ কংগ্রেসকে জনতার সংগঠন বলে অভিহিত করেন :

> কংগ্রেস মেঁ জনতা কা অংশ প্রধান হো গয়া হ্যায় অউর অসহযোগ নে এক জনতান্ত্রিক আন্দোলন কা রূপ লে লিয়া হ্যায়। উসকে জিম্মেদার কাম করনেওয়ালোঁ নে ভী স্পষ্ট রূপ সে বার বার ইস সম্বন্ধে মেঁ ঘোষণা কী হ্যায় জগহ্ জগহ্ কিসান-সভায়েঁ, মজদুর-সভায়েঁ কায়ম হো গয়ী হ্যাঁয় অউর উনকে হাম করনেওয়ালে অক্সর কংগ্রেস কে হী কার্যকর্তা হ্যাঁয় (সামাদী, ১৯৯৭ : ১৯৭)

প্রেমচন্দের গান্ধীভক্তির সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে গোরখপুরে গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনে। ১৯৩০ সালে এক নিবন্ধে তিনি গান্ধীজীকে অবতার বলে সম্বোধন করেন :

> মহাত্মা গান্ধী কিঁউ ভারত কে হৃদয় পর রাজ্য কর রহে হ্যাঁয়? ইসলিয়ে কি ওয়হ ইস বিকল জাগ্রতি কে জীতে জাগতে অবতার হ্যাঁয় ওয়হ ভারত কে সত্য, ধর্ম, নীতি অউর জীবন কে সর্বোত্তম আদর্শ হ্যাঁয় (সামাদী, ১৯৯৭ : ১৯৯)

প্রেমচন্দ গান্ধীর অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, জাতীয় শিক্ষা, চরকা কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন। তিনি কখনোই গান্ধী-বিরোধিতা সহ্য করেননি। শান্তিপ্রিয় প্রেমচন্দ গান্ধীজীর অনুগামী হলেও চরমপন্থীদের প্রতি তাঁর এক ধরনের আকর্ষণ ছিল। তাঁর প্রথম গল্প 'দুনিয়াকা সবসে অনমোল রত্ন'তে এর স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। এই গল্পে মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দেওয়া এক সৈনিকের বুকের ক্ষতস্থান চুইয়ে পড়া রক্তকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি

'আলহা' গল্পে রাজপুত বীর ভ্রাতৃদ্বয় আলহা ও উদলের আত্মত্যাগ এবং দেশরক্ষার জন্য বলিদানের মধ্য দিয়ে প্রেমচন্দ স্বদেশের এবং স্বকালের ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন (সামাদী, ১৯৯৭ : ২০৬)। 'জুগুন কী চমক' গল্পে পাঞ্জাবের রানী চন্দ্রকুমারীর মনোভাবনা প্রকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এনেছেন। 'বিচিত্র লোহী' গল্পে ইংরেজ চাটুকর এবং সুবিধাবাদী লালা উজাগরলালের আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ইংরেজ চরিত্র প্রকাশ

করেছেন। 'লাল ফীতা' গল্পে সরকারি কর্মকর্তা হরিবিলসের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের স্বার্থপর শ্রেণি-চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'সমরযাত্রা' গল্পে কোদাঈয়ের বাড়িতে সত্যাগ্রহীরা আসে। সেই আনন্দে বৃদ্ধা নোহরী নাচতে থাকে। পুলিশ এসে কোদাঈকে ধরে নিয়ে গেলে নোহরী গ্রামবাসীকে যুদ্ধযাত্রায় যেতে আহ্বান জানায়। তার ডাকে সবাই সাড়া দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বজনের অংশগ্রহণ এবং লড়াইয়ে শামিল হওয়ার বিষয়টি লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন।

প্রেমচন্দ ছিলেন গণমানুষের লেখক। দেশ ও দেশের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি ভাবতেন। সমকালে অনেকের মতোই তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারতের যাবতীয় দুঃখকষ্টের অবসান হবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতে ন্যায়-বিচারের অধিকার এলেই গ্রামে শান্তি ফিরে আসবে। সর্বসাধারণ ন্যায়ের পথে চলবে। তবে অনেক সমালোচক অভিযোগ করেন ১৯৩৩-এর পর থেকেই গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমতে থাকে। বিক্ষুব্ধ-চঞ্চল-অস্থির সময়ে তিনি ঝুঁকে পড়লেন প্রগতিবাদের দিকে। এ প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'তিনি সমাজতন্ত্র আনতে চান গান্ধীবাদী পন্থায়' (সামাদী, ১৯৯৭ : ২০০)। গান্ধীবাদ এবং সমাজতন্ত্র একীভূত করা প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা অনেকটাই অস্পষ্ট এবং স্ববিরোধী। তিনি সমাজতন্ত্রকে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি মনে করেন গান্ধীজী সমাজতন্ত্র থেকে অনেক এগিয়ে গেছেন, এমনকি সাম্যবাদ থেকেও। তিনি স্বরাজ চেয়েছেন। সেই স্বরাজ হবে অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন, রাজনৈতিক; এবং প্রতিরক্ষার সকল অধিকার থাকবে ভারতবাসীর হাতে। অর্থাৎ তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা।

পরিশেষে বলা যায় প্রেমচন্দ সমাজসচেতন সংবেদনশীল শিল্পী। লেখনীর মাধ্যমে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছেন। সত্যের পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করা মানুষকে সম্মান জানিয়েছেন। সারা জীবন লড়াই করেছেন মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে। আরও ভাল জীবনের জন্য এবং মুক্ত ভারতবর্ষের জন্য (চিত্রিতা, ২০০৪ : ৫০)। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই স্বদেশ সংলগ্ন। মানবিক বোধে উদ্ভাসিত হয়েই তিনি তাঁর ছোটগল্পে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। জীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব জীবনবোধের সংমিশ্রণে হিন্দি সাহিত্যকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের আসরে।

গ্রন্থপঞ্জি

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৯)। *নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর সামাজিক অবস্থান* (মিত্রম, কলকাতা)

কৃষ্ণা বসু (২০০৩)। *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ* (কলকাতা : প্রতিভাস)

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৪)। *হিন্দি সাহিত্যের রূপরেখা* (কলকাতা, পুস্তক বিপণী)

ছন্দশ্রী পাল (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : পরিবার ও সমাজ* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি)

দিলীপ কুমার মিত্র (২০০৪)। *হিন্দী সাহিত্যের পঞ্চ-সাধক* (কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২)। *লোকপুরাণ জনসমাজ ও কথাশিল্প* (ঢাকা, নান্দনিক)

মিল্টন বিশ্বাস (২০০৯)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নিম্নবর্গের মানুষ* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি)

মুনশী প্রেমচন্দ (১৯২১)। *প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ* (প্রসূন মিত্র অনূদিত), (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট্র)

রমেন্দ্র বর্মণ (১৯৮৯)। *রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা, বাণী প্রকাশ)

শুভঙ্কর রায় (২০১৩)। "তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলি আর কোয়েরীটোলা-ও ভারতবর্ষ", *সন্ধান*, (সম্পাদক : বিপ্লব মাঝি), (কলকাতা)

সফিকুন্নবী সামাদী (১৯৯৭)। *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা : শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি)

Arnold Green (1981). *Sociology* (London, Heinemann)